দুরুদুরু

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শিশু সাহিত্য সংসদ

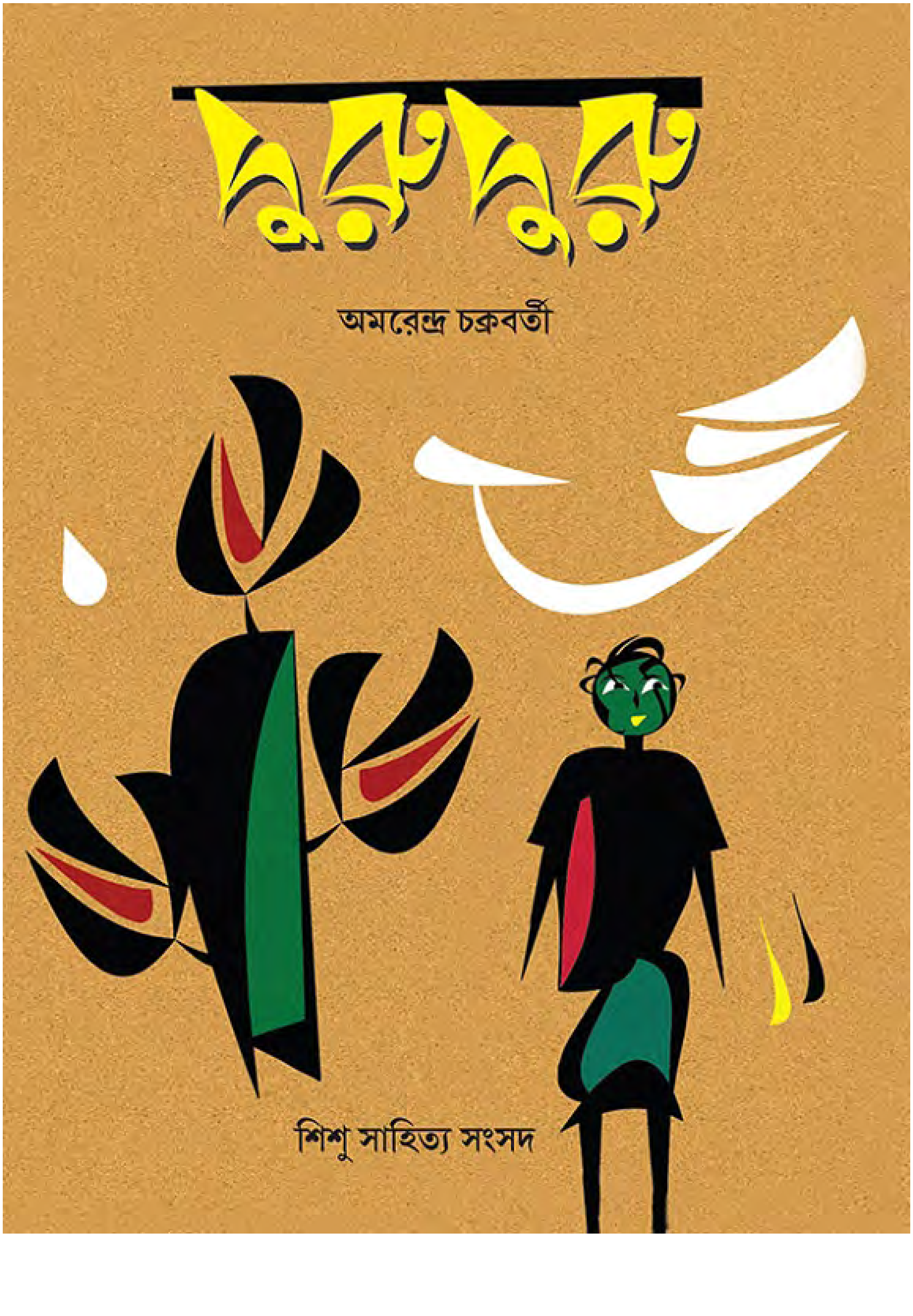
দুরুদুরু
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
শিশু সাহিত্য সংসদ

সব বয়সের ছোটোদের জন্য অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটো উপন্যাস

দুরুদুরু

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শিশু সাহিত্য সংসদ

DURUDURU
(A novella for children)
by Amarendra Chakraborty

ISBN : 978-93-88770-00-2

© লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ধ্রুব এষ
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রক : এস.পি. কম্যুনিকেশন প্রা. লি., মারলিন মেরিগোল্ড, ৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

স্নেহের তুষি,
'আষাঢ়ে গল্প'-এর লেখক মৈত্রেয়ী নাগ
কল্যাণীয়াসু

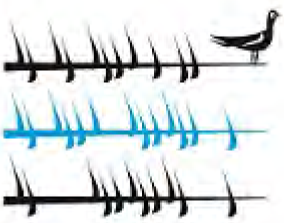

সূচি

দুরুদুরু

দুরুদুরু

'তুমি সাপ গাছ জানো?'

ছেলেটার সঙ্গে আমার আরেকটা নতুন দিন শুরু হল। বাঁ-হাত সব সময় মুঠো করে রাখে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছে। গায়ে একটা ঢলঢলে গেঞ্জি, নীল রঙের হাফ প্যান্ট, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কালো রবারের ওয়াটারপ্রুফ জুতো।

নদীর পাড়ে আমি বাঁধ দিতে ব্যস্ত। মুখ তোলার সময় পাইনি।

'তুমি সাপ গাছ জানো?' বলেই আগের মতো আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সে বাঁ-হাতের মুঠো খুলে কীসের একটা টুকরো বার করে ডান হাতে নিল। বাঁধের কাঁচা মাটিতে উবু হয়ে বসে মাটির ওপর সেটা দিয়ে ছবি এঁকে আমাকে দেখাল-'এই দেখো, সাপ গাছ।'

এই নাকি সেই গাছের ছবি! বললাম, 'এরকম গাছ তুমি নিজে দেখেছ?'

'না হলে আঁকলাম কী করে?'

'কোথায় দেখেছ?'

ছেলেটা উত্তর দিল না। চুপ করে ভাবছে।

এই আষাঢ়ের শুরুতেই সুন্দরবনের নদীগুলো জলে ফুলছে। নদীর পাড়ে ভোর থেকে আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটির বাঁধের ফাটল মেরামতির কাজে হাত লাগিয়েছি।

ছেলেটা হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। কোথায় থাকে, পাশের গ্রামে, না নদীর ওপারের কোনো গ্রামে, তাও জানি না। গ্রামের মেয়ে-বউরা যারা সারাদিন এককোমর জলে দাঁড়িয়ে নদী থেকে চিংড়ির মীন ধরে, তাদের একজন বলে বাঁশের ভেলায় চড়ে তাকে এদিকে আসতে দেখেছে। জঙ্গলে যারা মৌচাক ভেঙে মধু আনতে যায়, তাদের কে-একজন নাকি একদিন দেখেছে ছেলেটা মহিষের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে বনের ধার দিয়ে গ্রামের দিকে আসছে।

নদীপাড় উঁচু করে না বাঁধালে এক দিন দু-দিনের টানা বৃষ্টিতে গ্রাম ভেসে যাবে। সবাই হাতে হাতে মাটি বয়ে আনছে, ঝপাঝপ নদীর পাড় বরাবর চাপাচ্ছে, আমার কাজ মাটির স্তূপ ঠিকমতো সাজিয়ে নেওয়া। ফাটলগুলো বুজিয়ে দেওয়া। এ কাজে গ্রামের নানা বয়সের মেয়েরাও আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সারি সারি তারা কোমর ভেঙে কাদামাটি সমান করছে।

ছেলেটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল, এবার জেগে উঠে নীচু স্বরে বলল, 'একটা দ্বীপ আছে। তার চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। সেই দ্বীপে আমি সাপ গাছ দেখেছি। ভোর বেলা গাছটা নানা রঙের পাখির

কিচিরমিচিরে যেন বাজনা বাজায়। সাপ গাছটা কিন্তু কোনোদিন কোনো পাখিকে ছোবল দেয়নি। সাপ গাছে ফুল হয় না কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফুলের গন্ধ তোমার নাকে লাগবেই।'

'ফুল হয় না, তাহলে ছবিতে বড়ো বড়ো ওগুলো কী? ফুলের মতোই তো দেখাচ্ছে।'

'ওগুলোই গাছটার পাতা।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'কিন্তু দ্বীপটা যে কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি তা আর মনে পড়ে না। হয়তো কয়েক-শো বছর আগে দেখেছি। বা হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে। হয়তো অনেক আগের কোনো জন্মে দেখেছি দ্বীপটা। আমি কী করে গিয়েছিলাম, চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না।'

ছেলেটা কি তবে জাতিস্মর, না কি মানুষই না, আমার সামনে এ কি তবে জিন বা ভূত? সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কয়েক-শো বছর বা কয়েক হাজার বছর আগের কথা কি কেউ মনে করতে পারে? ওরকম হয় নাকি?'

'হতে পারে না? কারও জীবনেই হতে পারে না?'

'অসম্ভব।'

বিকেল শেষ হয়ে আকাশে পাতলা সন্ধ্যে নামছে, সন্ধ্যাতারাও ততক্ষণে ফুটে গেছে, সেদিকে আঙুল তুলে ছেলেটা বলল, 'এই তারাটা লক্ষ-কোটি বছর ধরে আছে তো? অথচ আজও একইরকম দেখতে পাই। আমার সেই দ্বীপও এই ভাবেই কোথাও কোনো মহাসাগরের বুকে জেগে আছে, যখন আমার সব মনে পড়বে তখন ঠিক আমি দেখতে পাব। পাব না? এই দেখো, আমার বুক দুরুদুরু করছে।' বলেই নদীপাড়ের কাদার ওপর দিয়ে সে দূরে কোথাও চলে গেল।

ছেলেটা এরকম হঠাৎ কখনো আসে, হঠাৎ চলে যায়। রোজ কথা বলে না। যেদিন বলে সেদিন তার ভারি অদ্ভুত সব কথা না শুনে পারি না।

একদিন অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'গাছ, পাখি, নদী আর আকাশের তারা ছাড়া মানুষ বাঁচে না জানো তো?'

কথাটা বলেই কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর আবার বলল, 'যে দেশে নদী নেই সে দেশের বড়ো দুঃখ। আমি দেখেছি। জানো তো, নদী মানুষের মায়ের মতো।'

হাতের কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে যুধিষ্ঠিরদাদা পিছন থেকে হাঁক পাড়ল, 'ঘটনাটা কী ঘটল রে অমেরতো? ছোঁড়াটা আজ আবার কী চায়?' আমার ভালো নাম অমর্ত্য। গ্রামের বয়স্করা আমাকে অমেরতো বলে ডাকে।

ছেলেটা ক-দিন ধরে প্রায়ই আমার কাছে আসছে বটে, কিন্তু কোনো দিন কিছু তো চায়নি। শুধু চারদিক দেখে। কখনো কিছু মনে এলে, বলে আমাকে। একদিন যেমন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখি কি না।

আরেক দিন, সেদিন শেষ রাত থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে বিকেলের দিকে আকাশ আলো করে সবে নদীর জলে শান্তি নেমেছে, পশ্চিমে দূর বনের মাথায় কমলা রঙের ছোপ ধরেছে, ছেলেটা কোথা থেকে এসে আমাকে বলল, 'কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছ, বলো।'

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বললাম, 'কই কিছু তো দেখিনি।'

'দেখেছ। মনে করতে পারছ না।' একটু পরে আবার বলল, 'আমি রোজ স্বপ্ন দেখি। মা বলত, স্বপ্ন দেখার সময় আমার মুখ নীল হয়ে যায়। আমার নামও তাই স্বপ্ননীল। তুমি আমাকে দুরুদুরুও বলতে পারো।'

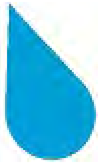

'তোমার নাম স্বপ্ননীল হলে তোমাকে দুরুদুরু বলব কেন?'

'আমার বুকটা মাঝে মাঝেই দুরুদুরু করে।'

'ডাক্তার দেখাও না? এ জন্য ওষুধ খাওনি কখনো?'

'বা রে, ওষুধ খাব কী করে? সাপ গাছের তিন পাতার এক-একটা গুচ্ছের একটা পাতাই এর ওষুধ। কিন্তু আমি তো গাছের পাতা ছিঁড়তে পারি না।'

সুন্দরবনের এই বানভাসি গ্রামে আমার পুরো ছয় ঋতু কেটে গেছে। এক বৈশাখে এসেছি, আরেক বৈশাখ পার হয়ে জ্যৈষ্ঠও শেষ হয়ে গেল। এসেছি স্কুলে পড়াবার কাজ নিয়ে। বানভাসির একমাত্র স্কুল এটা। নদীর নোনা জল ঠেলে সরিয়ে বাঁধ দিয়ে তার ওপর এই মাটির স্কুলবাড়ি বানিয়েছে গ্রামের মানুষ। মাটির দেওয়াল, টালির চালা। ছিল প্রাইমারি স্কুল। এ বছরই দশ ক্লাসের হয়েছে। আমিও সদ্য ছাত্রজীবন শেষ করে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেছি। স্কুলে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নানা কাজেও হাত লাগাতে হয়। নদীর পাড় ভাঙা ঠেকাতে বনকাঁটা গাছ বহুদূর অবধি শিকড় ছড়িয়ে মাটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। তার ডাল কেটে গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে লাগানোও একটা কাজ। সে কাজেও যখন যতটুকু পারি সাহায্য করি। গ্রামের সবার সুখদুঃখের শরিক হতে না পারলে বাইরের কাউকে গ্রামবাসীরাই বা বিশ্বাস করবে কেন!

একদিন বিকেলের দিকে ছেলেটা এল। এসেই বলল, 'সাপ গাছের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না, সেই দ্বীপের রাস্তাটা মনে করতে পারছি না তো।'

ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখায় ব্যস্ত ছিলাম, একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বেশ তো, যেদিন দ্বীপের রাস্তা মনে পড়বে সেদিনই নাহয় নিয়ে যেয়ো!'

গলার স্বরে রুক্ষ ভাব সে ঠিকই বুঝেছে। না হলে সে বলবে কেন, 'আমার কথায় রাগ করবার মতো কিছু ছিল বুঝি?'

এতক্ষণ খাতায় চোখ রেখে তার কথা শুনছিলাম, উত্তরও দিয়েছিলাম সেভাবেই। এবার মুখ তুলে অবাক হলাম। কোথায় তার গায়ে সেই ঢলঢলে গেঞ্জি! তার বদলে এ তো দেখছি যেন কোন অরণ্যরাজ্যের ছেলে। গায়ে মরা ডালপালায় জড়ানো শুকনো লতা-পাতার লম্বা জোব্বা, মাথায় পাখির পালকের টুপি। পালকও নানা রঙের!

আমার আশ্চর্য হওয়া তার চোখেই পড়ল না। বরং আমাকে আরও আশ্চর্য করে বলল, 'সাপ গাছের দ্বীপে তো নিয়ে যেতে পারব না, কিন্তু তোমাকে আমি পঞ্ছীপেড় গ্রামে যাবার পথ বলে দেব। পঞ্ছীপেড় বুঝেছ? পাখি গাছ। গ্রামের নামও পঞ্ছীপেড়। পাখি গ্রামও বলতে পারো। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের দেশে সেই গ্রাম। যাবে তুমি? যে মাসে সারাদিন আকাশে সূর্য রেগে থাকে, নীচে আগুন ঝরায়, মাটি শুকিয়ে ফাটা ফাটা হয়ে যায়, সেই মাসে আসব আমি।'

প্রথমে বলেছিল সাপ গাছের কথা। এখন আবার বলছে পাখি গাছের কথা। একটা কুয়াশাঘেরা দ্বীপে, আরেকটা জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে, কথাগুলো বিশ্বাসও হয় না, আবার একেবারে উড়িয়েও দিতে পারি না।

২

মে মাসের মাঝামাঝি স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি পড়তেই ছেলেটাকে নদীর ফাটল ধরা পাড় ধরে হেঁটে আসতে দেখে মনে পড়ল, তাই তো, এখনই তো সারাদিন সূর্য আগুন ঝরায়।

টুকটুকে লাল পাকা করমচার মতো থোকা থোকা ফলভরা একটা গাছের ছবি আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই সেই পঞ্জীপেড়। পাখি গাছ। পঞ্জীপেড় গ্রামে এরকম অনেক পাখি গাছ। এ গ্রামে সকাল থেকে সন্ধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ পাবে না, কাছে-দূরে শুধু পাখির সুরেলা স্বরের অবিরাম কথা বলাবলি। পাহাড় জঙ্গল সুরে ভরিয়ে পাখিরা সারাদিন যা-যা বলে সেসব যদি তুমি বোঝো তো অবাক হয়ে যাবে।'

ছেলেটার কথায় মন না দিয়ে আর থাকা যায় না। আমি বলে ফেললাম, 'জঙ্গলে সেই পাখিরা কী বলে? আমাকে শোনাতে পারো দু-একটা?'

'পাখি গাছের নীচে সারাদিন চুপ করে বসে থাকলেই তুমি পাখিদের অনেক কথা শুনতে পাবে। ও-গাছের লাল টুকটুকে ফল পাখিদের খুব প্রিয়।'

'যদি যেতে চাই যাব কী করে? তুমি কি আমাকে নিয়ে যাবে?'

'না, আমি তোমাকে পথ বলে দেব। একলাই যেতে হবে তোমাকে।'

একদিন ভোর বেলা এসে সে আমাকে পঞ্জীপেড় গ্রামের পথ বোঝাল।

গরমের ছুটিটা কলকাতায় স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য তৈরি হতেই কেটে গেল। এরপর স্কুলে সুন্দরীমেলার ষোলো দিনের ছুটি পড়তেই আমি বেরিয়ে পড়ার তোড়জোড় করতে লাগলাম। সুন্দরবনের এই মেলা তিন-শো বছর ধরে চলছে। বনের সুন্দরী গাছের নামে মেলার নামও সুন্দরীমেলা।

মেলার তৃতীয় দিনে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু দুরুদুরুর বলে দেওয়া রাস্তা আমার কাজে লাগল না।

একটা নদী থেকেই পঞ্জীপেড় গ্রামে যাবার পথ বুঝিয়ে দিয়েছিল দুরুদুরু। সেই নদীতীর থেকে ধ্রুবতারা নাকি খুব উজ্জ্বল দেখায়।

হাওড়া, শেওড়াফুলি, শ্বেত আকন্দপুর, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, যেখানে যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই পঞ্জীপেড় গ্রামে যাবার পাহাড়ি নদীর পথ দেখানো দূরের কথা, নামই শোনেনি।

ওদিকে শিয়ালদা, শিলিগুড়ি বা সাতমন্দিরতলা ইস্টিশানে যাকে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করি। ও নামের কোনো গ্রাম বা ধ্রুবতারা উজ্জ্বল দেখানো নদী যে কোথাও আছে, কেউ বিশ্বাস করে না বা জানে না।

এদিকে বাস, লরি, শেয়ারের ভাড়াগাড়ি বদলে বদলে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে সুন্দরীমেলার ছুটি ফুরিয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে গায়ে-মাথায় ধুলো মেখে শেষ পর্যন্ত সুন্দরবনে আমাদের গ্রামে ফিরে এলাম।

পরদিন ভোরে বিদ্যাধরী নদীর ফুটিফাটা নতুন বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছি, রাতে ভালো ঘুম হয়নি, নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ছেলেটা কোত্থেকে এসেই বলতে শুরু করল, 'পাহাড়, শুধু পাহাড়। শুধু পাহাড়ের সারি। তার পিছনে আবার পাহাড় সারি, তারও পরে আরও পাহাড়ের সারি। একটা সারির পিছনে মাথা তুলে আছে আরেকটা সারি। সব পাহাড়ই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। যেদিকে দেখবে শুধু পাহাড়ের গায়ে যেন কোটি কোটি সবুজ পশম ঢাকা ভেড়ার পাল অনন্তকাল ধরে গা ঘেষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে। সকালে-বিকেলে নীচ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসে সাদা মেঘ। পাহাড়ের কোলে যে যেখানে জায়গা পায় শুয়ে পড়ে। পঞ্জীপেড় গ্রামে থোকা থোকা লাল ফুলের অনেকগুলো গাছ। ওগুলোই পঞ্জীপেড়, পাখি গাছ। গাছগুলো খুব বড়ো না, এক-একটা গাছ একটা ঝোপের মতো। মাঝে মাঝে এক-একটা শুধু দশ-বারো ফুট লম্বা। লম্বা গাছের মাথায় পাখির ভিড় সবচেয়ে বেশি। সারাদিন পাখি আসার বিরাম নেই। অনেক পাখি আবার লাল টুকটুকে ফল খাওয়া শেষ করেই উড়ে যায়। ছোটো গাছগুলোতেও পাখির আসা-যাওয়া চলছেই।'

'তুমি গিয়েছিলে সেখানে? নিজের চোখে দেখেছ সেই পাখি গাছ?'

'আমি তো মাঝে মাঝেই যাই। পঞ্জীপেড় গ্রামটা তো আমার দাদুর গ্রাম।'

'তোমার দাদুর বাড়ি সেই গ্রামে?'

'পুরো গ্রামটাই তো দাদুর।'

'তার মানে তোমার দাদু গ্রামের মোড়ল?'

'না, না, মালিক।'

'গ্রামের আবার মালিক হয় না কি?'

ছেলেটা নদীর জলে ভোরের চকমকিতে চোখ রেখে কিছু ভাবতে লাগল। কাছেই গরান গাছটায় একটা পাখি এসে থেমে থেমে শিস দিচ্ছে।

'বুঝতে পারছ?' ছেলেটা নদী থেকে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে এনে বলল, 'পাখি কী বলছে, বুঝতে পারছ?'

'এ তো দোয়েল। শিস দিচ্ছে। দোয়েল তো সব সময় শিসই দেয়।'

'না, না। নিজের মনের কথা বলছে। আমি জানি ও কী বলছে। যে জানে না, সে জানে না।'

দোয়েল বরাবরের মতো শুধু শিসই দিচ্ছে, এর মধ্যে কথা-টথা আমি তো কিছুই বুঝলাম না। এবার অধৈর্য হয়ে বললাম, 'কোনো গ্রামের কারও মালিক হওয়ার ব্যাপারটা কী? সে কি শুধু তুমিই বোঝো? তুমিই জানো? আর কেউ তা জানতেও পারে না, বুঝতেও পারে না?' আমার গলার স্বরে বিরক্তি ও অবিশ্বাস চাপা গেল না।

ছেলেটা এবারও বোধ হয় দোয়েলের শিস শুনতে শুনতে কিছু ভাবছিল, হঠাৎই আমার কাছে এসে মুঠো করা বাঁ-হাতসুদ্ধই দু-হাতে আমার দু-হাত ধরে বলল, 'তুমি হবে পঞ্চীপেড় গ্রামের মালিক?'

'তুমি কি পাগল হলে নাকি?'

'পঞ্চীপেড়ই আমাকে পাগল করে ছাড়বে! সারাদিন সে-গ্রামের পাখিদের কথা শুনতে শুনতে আমার পাগল হবারই দশা। তুমিও যদি পাখিদের সেসব কথা বুঝতে পারো, সারাদিন শুধু তা নিয়েই ভাববে।'

ছেলেটা সত্যিই পাগল নাকি! কখন কী বলে বোঝার উপায় নেই। তা ছাড়া ওর এইসব পাগলামির কথা শুনে নষ্ট করার মতো সময়ই-বা আমাকে কে দেয়!

'হবে তুমি পঞ্চীপেড় গ্রামের মালিক? আমাকে এবার পঞ্চীপেড় ছেড়ে যেতে হবে। সাপ গাছের দ্বীপে যেতে হবে। দাদুও আর বেশি দিন পৃথিবীতে থাকবে না। এই দেখো, আমার বুক বড্ড দুরদুর করছে।'

বাঁ-হাতে বুক চেপে রেখেই কথাটা শেষ করল-'একজন কাউকে তো গ্রামের পাখিদের কথা শুনতে হবে!'

ওর কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দেখি কাছেই নদীর পাড়ে একটা নৌকো এসে কাদায় লগি পুঁতেছে। নৌকোর যাত্রীরা বেশির ভাগই আমার স্কুলের ছাত্র। এতটুকু নৌকোয় একসঙ্গে এত জনকে দেখে ভয়ের সঙ্গে রাগও হয়। এদিককার নদীতে এভাবে প্রায়ই নৌকোডুবি হয়ে প্রাণ হারায় অনেকে।

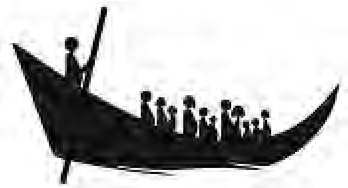

ডাঙায় ওঠা ছাত্রদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটাকে বললাম, 'শোনো, এখন আর সময় নেই আমার। আমি তো একজন শিক্ষক, স্কুলের সময় হয়ে গেছে আমার।'

'তুমি শিক্ষক? তুমি জানো, পঞ্জীপেড়ের পাখিরা কত কী শেখায়? যাবে তুমি পঞ্জীপেড় গ্রামে?'

ভোর থেকে ছেলেটার কথা শুনতে শুনতে কখন বেলা হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি, স্কুলেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার ওপর ওর এই প্রশ্ন শুনে আমার রাগ হয়ে গেল। আমিও এবার প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কী কী বই পড়েছ বলো তো?'

৩

বানভাসি গ্রামে আসার কিছু দিন পরই দেখেছি, গ্রামের একেবারে উত্তর কিনারে একটা জায়গা খালি পড়ে আছে। বেশ বড়ো জায়গা। সেখানে চাষ হয় না, কেউ বাসও করে না। অনেক কালই নাকি এরকম। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, বিরাট ওই পোড়ো জমিতে ভূতেদের বাস।

আমাকে ক-দিনের জন্য কলকাতায় যেতে হয়েছিল। তিন দিন পর নৌকো থেকে নেমেই দূর থেকে দুরুদুরুর সঙ্গে দেখা। বরাবরেরর মতো সে নদীপাড় ধরে আসছিল না, এল গ্রামের উত্তর দিক থেকে। তা নিয়ে আমার চোখে হয়তো বিস্ময় বা সংশয় বা কৌতূহল ফুটে উঠেছিল, সেটা লক্ষ করে দুরুদুরু কিছুটা উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'গ্রামের পোড়ো জমিতে পঞ্জীপেড়ের চারা পুঁতে এলাম।'

এও তার একটা পাগলামি। পাহাড়ের দেশের গাছ এখানে হয় নাকি! এখানে তো সব নোনা জলের নদী।

মুখে বলবার আগেই আমার মনের কথা বুঝে নিয়ে দুরুদুরু কিছুটা যেন দুঃখের গলায় বলল, 'জানি অসম্ভব। কিন্তু কাউকে না কাউকে চেষ্টা তো করতে হবে।'

ধান খেতের আল ধরে স্কুলের দিকে দু-জনে হেঁটে যাচ্ছি, বেশ কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। কী একটা পাখি ডাকতে ডাকতে আকাশের একদিক থেকে আরেক দিকে উড়ে যাচ্ছে দেখে দুরুদুরু নিজের মনেই বলল, 'হায়! পাখি, গাছ, নদী না থাকলে মানুষও থাকবে না!' তারপর হঠাৎই যেন আমার উপস্থিতি টের পেয়ে আমাকে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই এটা জানো?'

ঠিক এভাবে বলা যায় কি? এত জোর দিয়ে? বললাম, 'ঠিক জানি না।'

'সে কী, কেন? তুমি তো শিক্ষক!'

'একজন শিক্ষককে স্কুলে শুধু একটা বিষয়ই পড়াতে হয়, যে বিষয়টা সে নিজে ভালো করে পড়েছে।'

'একটা বিষয়? সাগর, পাহাড়, পাখি, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, একটা মাত্র বিষয়ে এত কিছু ধরবে কী করে!'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তিন দিন ছিলাম না, স্কুল কামাই হয়েছে, সিলেবাস এখনও অনেকটা বাকি!'

'সিলেবাস কী?'

স্কুল এসে গেছে, এই স্কুলবাড়ির একটা ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা। সেখানে হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখেই ক্লাসে ঢুকতে হবে। বললাম, 'সে তুমি বুঝবে না। আমি এবার স্কুলে ঢুকব।'

'সিলেবাস কি সাপ গাছের দ্বীপের কুয়াশার চেয়েও দুর্ভেদ্য? ভেতরে ঢোকা খুব শক্ত?'

এবার তো দাঁড়াতেই হয়। বললাম, 'সারা বছর কোন বইয়ের কী কী পড়তে হবে, বছরের প্রথমেই তার একটা ফর্দ বানানো হয়। সেই ফর্দটাই সিলেবাস, তুমি ঠিক বুঝবে না।'

দুরুদুরু ভারি অবাক হয়ে বলল, 'তাতে পঙ্খীপেড়ের কথা থাকে? সাপ গাছের পাতার কথা থাকে? সেই পাতার দোলায় তৈরি হাওয়ার কথা থাকে-যে হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ আর কোনো মন্দ কাজ করে না?'

ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা পড়তেই আমি দুরুদুরুর উদ্ভট সব ভাবনার কথা শোনায় ক্ষান্তি দেবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

'ক্লাস শুরু হচ্ছে, আমি যাচ্ছি।' বলে সোজা স্কুলে ঢুকে পড়লাম।

এরপর অনেকদিন দুরুদুরুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একজন মউলির মুখে শুনলাম সে একদিন ভোর বেলা ছেলেটাকে উত্তর কিনারের পোড়ো জমির দিকে যেতে দেখেছে। আবার সেদিনই বিকেলে বন থেকে মধু নিয়ে ফেরার সময় তাকে ফিরতেও দেখেছে।

গ্রামে এল, সারাদিন পোড়ো জমিতে কাটাল, অথচ আমার সঙ্গে দেখা হল না, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

কার্তিক মাসে ধান কাটা শেষ হবার পর একদিন আমি আল ধরে হেঁটে আমার এক অসুস্থ ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছি, দেখি দুরুদুরু আমার দিকেই আসছে। ছাত্রটির বাবা চাষি, বাবার সঙ্গে ছেলেও গত ক-দিন ধান খেতেই কাটিয়েছে। দুপুরের রোদ আর সকাল-সন্ধ্যের শিশির মাথায় লেগে তার জ্বর হয়েছিল। স্কুলে আসেনি।

তাদের মাটির বাড়িটা যখন প্রায় এসে গেছে, তখনও দুরুদুরু আমার দিকেই হেঁটে আসছে। তার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি কিছুক্ষণ ধান খেতের আলপথেই হেঁটে বেড়াও, একটু পরে আসছি আমি।' আমাকে হনহন করে হেঁটে যেতে দেখে ধান খেতের পাখির ঝাঁক উড়ে গেল।

এ গ্রামে কোনো ডাক্তার নেই, ওষুধও পাওয়া যায় না। তবু বিনা চিকিৎসায় ছেলেটি অনেকটাই সেরে উঠেছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। কাল স্কুল যাবারও ইচ্ছে তার।

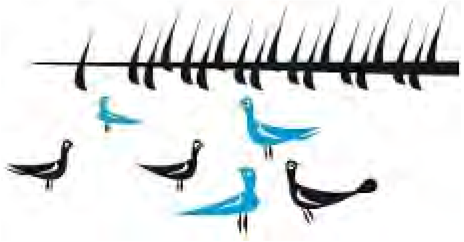

বাইরে এসে দেখি দূরে দুরুদুরু খেতের পাখিগুলোর খুব কাছে বসে তাদের দেখছে। ধান কেটে নেবার পর ধানখেতে যেসব ধান পড়ে থাকে, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সেগুলো ইঁদুরে খায় আর দূর থেকে উড়ে এসে পাখিরা খেয়ে যায়। দুরুদুরু একমনে পাখিদের দেখছে। আমি তার কাছে এসে দাঁড়াতে সে ইশারায় আমাকে তার পাশে নীচু হয়ে বসতে বলল। তার নজর পাখিদের ওপর। ছাত্রের বাড়ি যাবার সময় পাখিরা উড়ে গিয়েছিল, এখন দেখছি দিব্যি ফিরে এসে খুঁটে খুঁটে ধান খাচ্ছে। ধান গাছের স্যাঁতসেঁতে গোড়ায় ঝাঁক ঝাঁক ধানচড়াইয়ের ভিড়।

এমনিতেই খেতের বেশিরভাগ আমাদের চেনা পাখি, দু-তিনটে পাখি শুধু অচেনা। ওরকম একটা অচেনা পাখি দেখিয়ে দুরুদুরু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'পঞ্জীপেড়ের পাখি।'

'তোমার পঞ্জীপেড়ের চারা এর মধ্যেই বড়ো হয়ে গেল নাকি?'

আমার গলার আওয়াজেই সব পাখি একসঙ্গে উড়ে গেল।

দুরুদুরু উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি ধৈর্য শেখোনি।'

ধৈর্যের কথা বলল কেন? আমার কথার শব্দে পাখি উড়ে গেল বলে? না কি পঞ্জীপেড়ের চারার কথা জিজ্ঞেস করেছি তাই? আমি তো ভেবেছিলাম ওর সেই চারাগাছ বড়ো হয়েছে বলেই তার টানে পঞ্জীপেড়ের পাখি এ গ্রামে এসেছে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলল, 'পঞ্জীপেড় গ্রামে যাবে তুমি?'

'যেতে খুব ইচ্ছে করে। গাছটা একদিন স্বপ্নেও দেখেছি।'

'সে আমি জানতাম। কিন্তু স্কুল ছেড়ে, এই গ্রাম ছেড়ে, নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে?'

'রাস্তা চিনব কী করে?'

'দেখি, যদি পারি আমিই নিয়ে যাব।'

'একটু ভাবি। বাড়িতে কথা বলি। স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের অনুমতিও নিতে হবে।'

দুরুদুরু আমার চোখের সামনেই দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

৪

অনেকদিন তাকে আর দেখা যায়নি। একদিন দুপুরে হঠাৎ এসে হাজির। মুখ দেখে বোঝা যায় তার মন দুঃখে ভরে আছে। বেশ খানিকক্ষণ নীরব থেকে আপন মনে কথা বলার মতো বলতে থাকল, 'সাপ গাছের একটা পাতা এ মাসেই ঝরে পড়বে।'

'বাঃ! এবার তাহলে তোমার বুক দুরুদুরুও সেরে যাবে!'

'না, তা কী করে হয়! ও গাছের একটা পাতা ঝরে পড়লে গাছটার আয়ুও তো এক-শো বছর কমে যাবে।'

'তোমার তো কিছু করার নেই। গাছের পাতা তুমি গজাতেও পারো না, ঝরাও আটকাতে পারো না।'

'গজাতে পারি না ঠিকই, কিন্তু ঝরাও কি আটকাতে পারি না? পারতে হবে আমাকে। চেষ্টা করে দেখতে তো পারি।'

'তোমার বুকের কষ্ট সারাতে যে গাছের একটা পাতা তুমি ছিঁড়তে চাও না, যে গাছের একটা ঝরা পাতা পেলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে, সেই পাতাটাও ঝরতে দিতে চাও না কেন? ঝরার সময় হলে গাছের পাতা তো আপনা-আপনিই ঝরে যায়।'

মনে হল জোর করে ও চোখের জল আটকে রেখেছে, কথাও বলছে না, দু-চোখ বুজতেই তার গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল নামল।

ওর চোখ খোলার অপেক্ষায় শুধু মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি আমি? এভাবেই আরও কিছুক্ষণ নিষ্ফল চলে যাবার পর দুরুদুরু মুখ খুলল। যেন খুব দূর থেকে কথা বলছে এমনভাবে বলল, 'একটা পাতা ঝরে গেলে পৃথিবীর মানুষ তো আরও দোষ করতে থাকবে। যা করা উচিত নয়, তা-ই করতে চাইবে।'

দুরুদুরু বাঁ-হাতে বুক চেপে ধরে থেকে কিছুক্ষণ পরে বেশ কষ্ট করে কথাটা শেষ করল, 'সবাই তখন মিথ্যে কথা বলবে!'

ওর কষ্ট হচ্ছে দেখেও না বলে পারলাম না, 'সাপ গাছের একটা পাতা ঝরলেই এমন হয় নাকি?'

'সাত-শো বছর আগে একটা পাতা ঝরার পর থেকেই মানুষের মিথ্যে কথা বলার শুরু।'

আকাশ কালো। বাতাস থম মেরে আছে। গুমোট গরম। ঝড় উঠবে মনে হয়। ঝড়ে সুন্দরবনের এই সব গ্রামের অনেক ক্ষতি। আমাদের স্কুলবাড়ির চালা উড়ে যাবে না তো?

দুরুদুরু তখনও বুক চেপে দাঁড়িয়ে। মনে হয় আরও কিছু বলবে।

'পঙ্খীপেড়ের পাখি সেই কোন আদি যুগে সাপ গাছের একটা ঝরা পাতা মাটিতে পড়বার আগেই ঠোঁটে করে নিয়ে এসেছিল বলে পাখিরা মিথ্যে বলতে জানে না। বনের হরিণ, কাঠবিড়ালি, ঝিঁঝিপোকা এরা কেউ মিথ্যে বলে না। জঙ্গলে সারারাত কতরকম কীটপতঙ্গ নিজেদের মধ্যে কত কথা বলে, কতরকম তার আওয়াজ, কেউ একটাও মিথ্যে আওয়াজ করবে না। এরা সবাই পাখির বয়ে-আনা পাতার হাওয়ার ছোঁয়া পেয়েছিল।'

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে দুরুদুরু বলল, 'বিশ্বাস দিয়ে পৃথিবীর কতটুকুই বা জানা যায় বলো! একসময় তো মানুষের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীটাই দাঁড়িয়ে আছে, সূর্যই তার চারপাশে ঘুরছে।'

কথাটা বলেই সে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বললাম, 'সে দ্বীপ তুমি খুঁজে পাবে কী করে?'

'পঙ্খীপেড়ের পাখি আমাকে পথ দেখাবে।'

'অত দূরের পথ, পাখি চিনবে কী করে?'

'বরফের দেশের পাখিরা হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে তোমাদের দেশে আসে না?'

দুরুদুরু আর দাঁড়াল না। নদীর ধার বরাবর বহু দূর অবধি হাঁটতে লাগল। ক্রমশ ছোটো হতে হতে একেবারে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার চলে যাওয়ার দিকে আমি শুধু চেয়ে রইলাম। স্কুলে ফেরার তাড়া না থাকলে হয়তো ছুটতে ছুটতে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনতাম।

ওর কথাগুলো মানি না-মানি, আমার মন থেকে কিছুতেই মোছা যাচ্ছে না। নিজের কাজে যখন ব্যস্ত, তখনও তার কোনো-না-কোনো কথা মনে ভেসে উঠছে।

কিছুক্ষণ পরই চোখে পড়ল, দুরুদুরু ফিরে আসছে। কাছে এসে বুকে হাত চেপে বলল, 'গ্রামের উত্তরে পাখি গাছে নতুন শাখা বেরিয়েছে। যত্ন নিয়ো। গাছের ডালপালা যত বাড়বে, পাখিদের আনাগোনাও ততই বাড়বে। নীচে বসে তুমি তাদের কথা শুনো। তারাই একদিন তোমাকে পাহাড় ঘেরা পাখিগ্রামের পথ বলে দেবে।'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে চুপ করে গেল। হয়তো দম নেবার জন্য। তার মুখ নীল হয়ে উঠছে। দু-চোখ বোজা। হয়তো স্বপ্ন দেখছে। হয়তো আরও কিছু বলতে চায় আমাকে।

আমি এসব সময় যেমন থাকি, চুপ করে আছি। দুরুদুরু হঠাৎ চোখ খুলে তাকাল। নদীর দিক থেকে ঝড় ঝাঁপিয়ে আসছে দেখে বলে উঠল, 'আমার আর সময় নেই! পাতাঝরা আমাকে আটকাতে হবে।'

ঝড় তো নয়, এ তো নদী-ওড়ানো ঝড়! তার মুঠো করা বাঁ-হাতটা ধরে বললাম, 'ঝড়ের মধ্যে এখনই যেয়ো না।'

দুরুদুরু কিছু বলল না। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল। মনে হয় যেন উড়ে গেল।

এরপর তাকে আর কেউ দেখেনি।